কেন এই অধঃপতন?

উম্মাহর অধঃপতনের ইতিহাস ও কারণ

মুহাম্মাদ কুতুব

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

'মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন' এই শিরোনামে আমরা অনেক আলাপ-আলোচনা শুনি এবং দেখি। এটা আসলে আমাদের কাছে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে। এক হলো, মুসলিমরা অধঃপতিত অবস্থায় আছে। আর দ্বিতীয় হলো, তাদের এই অধঃপতন থেকে উত্তরণ হওয়া জরুরি। কিন্তু অধঃপতন থেকে উত্তরণ লাভের জন্য জরুরি হলো, অধঃপতনটাকে জানা এবং বোঝা। কীভাবে আমাদের অধঃপতন হলো, আমাদের ত্রুটি কোথায়, কারা আমাদের অধঃপতন কামনা করে, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা এবং সেই অনুযায়ী কাজের পরিকল্পনা সাজানো। বক্ষ্যমাণ বইটি পাঠককে এই বিষয়গুলোর উত্তর সম্পর্কে জানাবে।

লেখক মূলত বইটিতে আমাদের অধঃপতনের দুটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একটি দিক হলো, মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণভাবে মুসলিমরা কোন সব ভুল করেছে এবং নিজেদের কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করেছে। আরেকটি দিক হলো, এই অধঃপতনের ক্ষেত্রে বহিরাগত শত্রুরা কীভাবে কাজ করেছে এবং আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রগুলোকে টার্গেট করে ধ্বংস করেছে। মূলত যেকোনো অধঃপতনেরই এই দুটি দিক থাকে। যেকোনো কিছুর অধঃপতনকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হলে উল্লেখিত দুটি দিককেই জানা ও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আর মুহাম্মাদ কুতুব ﵀ তাঁর বিখ্যাত বই 'ওয়াকিউনাল মুআসির' বইয়ে এই কাজটিই করেছেন। পাঠকের হাতে থাকা 'কেন এই অধঃপতন?' বইটি মূলত এরই সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত অনুবাদ।

এই বইটিকে বলা যায় লেখকের মাফাহিম ও জাহিলিয়াত বইদুটির সম্পূরক রচনা। বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা সংক্ষেপণ ও পরিমার্জনের পন্থা অবলম্বন করেছি। অধঃপতনের আলোচনার পর ইসলামি বিপ্লব নিয়ে লেখক প্রায় ২০০ পেইজের মতো আলোচনা করেছেন। সেখানে বেশকিছু আলোচনার পুনরাবৃত্তি ও অপ্রাসঙ্গিকতা থাকার কারণে সেই অংশের অনুবাদ যুক্ত করিনি; বরং সেই অংশ থেকে করণীয় সম্পর্কে একটি সারাংশ বের করে কয়েক পেইজে সেটা আমরা নিজেদের ভাষায় যুক্ত করে দিয়েছি উপসংহার হিসেবে।

মুহাম্মাদ কুতুব হলেন সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম, আধুনিক দ্বীনহীন সভ্যতাকে জানতে এবং এর বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন গড়ে তুলতে যাদের পাঠ করা জরুরি। বলা যায়, তিনি এই সারির লিডিং লিস্টেই থাকবেন। কিছু দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও লেখকের ব্যাপারে অনুবাদক এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে থাকি।

মহান আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বপ্রথম লেখকের জন্য দুআ করি। তিনি আখিরাতে লেখকের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন এবং মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

তারপর দুআ করি, বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের খিদমতকে আল্লাহ দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন এবং উম্মাহকে বইটির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত করুন। আমিন।

- ইফতেখার সিফাত

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা ⁞ ০৯

সোনালি প্রজন্মের আদর্শ ⁞ ২১

মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি ⁞ ৪২

- এক. ইমানের সততা, কুরআন-সুন্নাহ থেকে আন্তরিকভাবে আহরণ এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে একনিষ্ঠতা ⁞ ৪৪
- দুই. সঠিক অর্থে এক উম্মাহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা ⁞ ৬০
- তিন. বাস্তব জীবনে ইসলামি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা ⁞ ৭৬
- চার. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নৈতিকতা ⁞ ৯১
- পাঁচ. প্রতিশ্রুতি পূরণ করা ⁞ ১০৩
- ছয়. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ⁞ ১০৯
- সাত. ইসলামি সভ্যতার জাগরণ ⁞ ১২৭

ইসলামি সভ্যতার স্বতন্ত্রতা ⁞ ১৩৫

অধঃপতনের গতিপথ ⁞ ১৪৩

যেখান থেকে সূচনা ⁞ ১৪৯

- উমাইয়া শাসনামল ⁞ ১৪৯
- আব্বাসি শাসনামল ⁞ ১৫৮
- উসমানি শাসনামল ⁞ ১৮২

অধঃপতনের পদরেখা ⁞ ১৮৯

- ১. বিশ্বাসগত অধঃপতন ⁞ ১৮৯
- ২. জ্ঞান, সভ্যতা, অর্থনীতি, সামরিক, চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক পতন ⁞ ১৯৭
- ৩. ক্রুসেড যুদ্ধ ও উপনিবেশ ⁞ ২০৬
- ৪. বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ⁞ ২১৬

শিক্ষাব্যবস্থা ⁞ ২১৭

ফরাসি হামলার ভূমিকা ⁞ ২১৯

মুহাম্মাদ আলির ভূমিকা ⁞ ২৬৬

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ও তাদের অনিষ্টতা সৃষ্টির মাধ্যমসমূহ ⁞ ২৩৮

এক. শিক্ষা-সিলেবাস ⁞ ২৪০

দুই. প্রচারমাধ্যম ও মিডিয়া ⁞ ২৫৭

তিন. নারী-স্বাধীনতার ইস্যু ⁞ ২৭০

চার. চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র ⁞ ৩০০

পাঁচ. রাজনৈতিক ক্ষেত্র ⁞ ৩০৯

সেক্যুলার নেতৃত্বের উত্থান ও ধর্মীয় নেতৃত্ব-শূন্যতা ⁞ ৩১৪

ইউরোপীয় সংবিধান ও মূলনীতি আমদানি ⁞ ৩২৮

সামরিক বিদ্রোহ ও সমাজতন্ত্রকে ইসলামের সাথে যুদ্ধে ব্যবহার করা ⁞ ৩৪০

উপসংহার ⁞ ৩৫৪

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা

মুসলিম-বিশ্ব এখন ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ সময় পার করছে। এই সময়টাকে আমরা ইহুদিদের দিগভ্রান্তির সময়ের সাথে তুলনা করতে পারি। পূর্বে মুসলিম-বিশ্ব বহু বিপদ-সংকটে পতিত হয়েছে; বরং কঠিন দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছে। কখনো মুসলিমরা তাদের ভূমির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা-হীনতায় ভুগেছে, আবার কখনো বাড়িঘর ও সম্পদশূন্য হয়েছে। তবে ইতিহাসে তারা কখনো বর্তমান সময়ের মতো ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়নি।

ইসলামের সূচনালগ্নে ইরতিদাদের ফিতনা ছিল নিঃসন্দেহে এক তীব্র আঘাত। যা নবগঠিত রাষ্ট্রকে অঙ্কুরেই ধ্বংসের উপক্রম করেছিল। কিন্তু আল্লাহর নীতি সম্পর্কে জ্ঞাত কারোর মনে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ জন্ম নেয়নি যে, বিজয় শুধুই মুসলিম-রাষ্ট্রের হবে, জাজিরাতুল আরবের মুরতাদদের নয়। কেননা, মুসলিমরা যে সত্যকে গ্রহণ করেছে, এর প্রতি ঈমান, রবের সাথে সম্পর্কের গভীরতা এবং দ্বীনের প্রতি তাদের ইখলাস ছিল বাতিলের প্রতি মুরতাদদের বিশ্বাসের চেয়ে বহু গুণ বেশি। এ ছাড়া মুরতাদদের অবস্থানের পেছনে তাদের প্রবৃত্তি ও নফসের চাহিদা ব্যতীত কোনো সত্যিকার আদর্শ-মূল্যবোধ ছিল না।

অন্যদিকে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধে সাহাবিদের উৎকণ্ঠা এবং আবু বকর ﷺ-কে বিলম্বের পরামর্শ দেওয়া এ জন্য ছিল না যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করবেন কি না তা নিয়ে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন; বরং তাঁরা বিলম্ব করতে চাচ্ছিলেন; যাতে যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত সেনা সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু আবু বকর ﷺ-এর মজবুত ঈমান ও দ্বীনকে জমিনে বিজয়দানের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদার প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং আল্লাহর আদেশের বিরোধীদের ওপর নির্ধারিত শাস্তি প্রদান না করে ছেড়ে রাখতে অস্বীকার করা, এগুলো সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে তাঁরা আবু বকর ﷺ-এর পেছনে সারিবদ্ধ হন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন।

উসমান ﷺ-এর হত্যার ফিতনা এবং একে কেন্দ্র করে আলি ﷺ ও মুআবিয়া ﷺ-এর মাঝে সংঘাত ছিল মুসলিমদের ও মুসলিম-রাষ্ট্রের জন্য চরম সংকট, যে রাষ্ট্র তখনও সূচনালগ্নেই ছিল এবং চতুষ্পার্শ্বের পুরো বিশ্বের শত্রুতা বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তখনকার ঘটনাচক্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে এর সমাপ্তি নিয়ে কারও সন্দেহ থাকবে না; কেননা, বিরোধ যত গভীর বা এর প্রভাবে মুসলিমসারিতে ফাটল সৃষ্টি হোক, মূল বিরোধ ছিল ইসলামকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে, স্বয়ং ইসলাম নিয়ে নয়। সেখানে এই প্রশ্ন ছিল না যে, ইসলাম কি মুসলিমদের জীবনাদর্শ হবে, না ভিন্ন কিছু। তেমনই সেই সময় অন্য কোনো জাতির মাঝে সত্যের কোনো অংশ ছিল না বা কোনো কাফির জাতির নিজেদের জীবনাদর্শের প্রতি মুমিনদের তাদের দ্বীনের প্রতি ইমানের তুলনায় অধিক বিশ্বাসী ছিল না। আর আল্লাহ তাআলার নীতি অনুযায়ী সৈন্যসংখ্যা, সরঞ্জাম ও যুদ্ধের পরিকল্পনার পূর্বে এটাই হচ্ছে মূল উপাদান, যার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জয় বা পরাজয় নির্ধারিত হয়। যদিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসবাব গ্রহণের আদেশ প্রদানের ভিত্তিতে এগুলো ফলাফলের পাল্লাকে প্রভাবিত করে এবং এগুলো চিরন্তন নীতির অংশ, তবে শুধু বস্তুগত আসবাব দ্বারা ফলাফল নির্ধারিত হয় না।

ক্রুসেড যুদ্ধ ও তাতারদের আক্রমণ ছিল মুসলিমদের জীবনে বিশাল এক আঘাত। তখন কিছু সময়ের জন্য মনে হয়েছে যে, এই হামলাগুলো পুরো মুসলিম-বিশ্বকে হয়তো পতন ঘটিয়ে ফেলবে এবং জমিনের বুক থেকে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু বাস্তব ফলাফল ছিল ভিন্ন, সর্বশেষ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য এসেছে। প্রথমে পরাজয় ও শেষে বিজয়, দুটোই আল্লাহর নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ, যার কখনো ব্যতিক্রম হয় না।

তখন মুসলিমদের অবস্থা ছিল অনেক খারাপ। তাদের মাঝে অপরাধ, বিদআত, ভ্রষ্টতা ও বিচ্ছিন্নতা চরম আকার ধারণ করেছিল। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের সাহায্য ও জমিনে তা প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত ছিল। তাই শত্রুবাহিনী মুসলিম-ভূমিতে আক্রমণ করে তাদের খিলাফতের পতন ঘটায়। কিন্তু ইসলামি আকিদার অগ্নিশিখা তখনও তাদের অন্তরে প্রজ্বলিত ছিল; যদিও তাতে অবহেলা, নেতিবাচকতা ও দুনিয়ার প্রবৃত্তির ধুলোর আস্তর পড়েছিল। কিন্তু যখনই যোগ্য নেতৃত্ব এসে সঠিক ইসলামে ফিরে আসার আহ্বানের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের দিকে আনার চেষ্টা করেছেন, তখন তাদের ইমানের অগ্নি জ্বলে উঠেছে। অতঃপর এর ফলশ্রুতিতে বিজয় এসেছে।

যখন সালাহুদ্দিন এসে বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুতির কারণে পরাজিত হয়েছ; তাই সঠিক পথে ফিরে আসা ব্যতীত কখনোই বিজয়ী হবে না'... যখন ইবনে তাইমিয়া এসে গোমরাহ ও ভ্রষ্টদের ভ্রান্তি থেকে আকিদা পরিশুদ্ধ করার দাওয়াহ দিয়েছেন... যখন কুতুজ ময়দানে এসে চিৎকার দিয়েছেন, 'ওয়া ইসলামাহ!' আর মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ জনতা তাদের অনুসরণ করে তাদের বিশ্বাস ও আচরণে আল্লাহর সাথে সততা রক্ষা করেছে, তখনই বিজয় এসেছে। মুসলিমরা তাদের চেয়ে বহু গুণ বেশি কাফির ও মুশরিকদের ওপর জয়ী হয়েছে।

আন্দালুসের বিপর্যয় ছিল মুসলিমদের ওপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ। যা তাদের বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য, পারস্পরিক সংঘাত, একে অপরের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার বাহিনীকে সাহায্য করা ও তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা এবং দুনিয়ার বৈধ-অবৈধ ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়ার ফলে আপতিত হয়েছে।

আন্দালুস পরবর্তী সময়ে ইসলামের ছায়ায় ফিরে আসেনি, তবে সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কেননা, ঠিক যে সময় আন্দালুসে ইসলামের ছায়া মুছে গেছে, তখন সেখানে আরেক নতুন শাসনের উদয় হয়েছে। যারা একাধারে চার শতাব্দী যাবৎ মুসলিমদের শক্তি-শাসন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে এবং ক্রুসেড-বিশ্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভিয়েনা ও পিটার্সবার্গ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের হাতে ইউরোপ ও এশিয়ার লক্ষ-কোটি মানুষ মুসলিম হয়েছে।

কিন্তু মুসলিমদের বর্তমান বিপর্যয় পূর্বের সবগুলো থেকে কঠিন ও ভয়াবহ। আমার এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, এটাও একসময় কেটে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা আবারও মুসলিমদের দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তবে বর্তমানে আমাদেরকে এই বিপর্যয়ের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করতে হবে; যাতে বুঝতে পারি, এই বিপদ কেন পূর্বের সবগুলো থেকে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং সেই সাথে এটা থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে জানতে পারি। তখন আমরা মুক্তির উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব।

যখন ক্রুসেড যুদ্ধের প্রথম ধাপ শুরু হয়েছিল, যা প্রায় দুই শতাব্দী (১০৯৬-১২৯১) যাবৎ চলমান ছিল এবং যার পূর্বে-পরে তাতারদের হামলা হয়েছিল, তখন মুসলিমরা সঠিক ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যায়-ভ্রান্তি, বিদআত ও আসবাব গ্রহণের অনীহা ইত্যাদি সমস্যায় নিমজ্জিত ছিল; কিন্তু মৌলিক ইসলাম নিয়ে তাদের অন্তরে কোনো প্রশ্ন ছিল না। ইসলামের আকিদা, জীবনবিধান ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে কোনো ভিন্নমত ছিল না; এমনকি যখন তারা ক্রুসেড ও তাতারদের সামনে পরাজিত হয়েছে, তা এ

জন্য ছিল না যে, তাদের অন্তরে ইসলামের আকিদা বা শাসনব্যবস্থা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল; বা তারা শত্রুদের বিশ্বাস, চিন্তাধারা, অনুভূতি, আচরণ ও জীবনব্যবস্থার ব্যাপারে জানার জন্য তাদের সামনে পরাজিত হয়েছে; অথবা এক মুহূর্তের জন্য তাদের ধারণা হয়েছে যে, শত্রুদের কাছে সত্যের কোনো অংশ আছে; বা ইসলাম ব্যতীত অন্য বিশ্বাস-চিন্তাধারা ও জীবনব্যবস্থায় কোনো হক বা সত্য থাকা সম্ভব। আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন নিয়ে তাদের মাঝে কোনো সন্দেহ বা বিতর্ক ছিল না। কেননা, এটা তাদের ইসলামের আবশ্যকীয় অংশ ছিল; বরং তাদের অনুভূতি ছিল যে, মুসলিম হওয়ার জন্য এই বিষয়টা প্রত্যক্ষভাবে আবশ্যক।

তাই তারা দীর্ঘ সময় পরাজিত থেকেও কখনো হীনম্মন্য হয়নি বা এমন অনুভব করেনি যে, তারা শত্রুদের থেকে কোনো দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে; বরং তাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর বাস্তবায়ন ছিল—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

> ‘তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং বিষণ্ণ হয়ো না। (প্রকৃত) ইমানদার হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।’[১]

আর তারা ছিল মুসলিম।

এমনকি তারা পরাজিত হয়েও শত্রুর প্রতি কঠিন ঘৃণা পোষণ করেছে; কেননা, তাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সঠিক আকিদা ও স্বচ্ছ চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তাদের চরিত্র ও আচরণ ইসলামের আখলাক ও আচরণের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। তাদের কাছে তাতাররা ছিল অসভ্য ও বর্বর। ক্রুসেডাররা ছিল ক্রুশপূজারি মুশরিক। এ ছাড়া তারা ছিল চরিত্রহীন লম্পট, যাদের মাঝে সম্ভ্রম-সম্মানের কোনো মূল্য নেই।

কিন্তু সর্বশেষ ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে, ততদিনে অবস্থা পূর্বের থেকে অনেক পালটে গেছে। মুসলিমরা সত্যিকার ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। শুধু কার্যক্রমে নয়; বরং তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও।

ইসলামের মূল ভিত্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র বুঝ পরিবর্তন হয়ে তা শুধু মুখে জপ করার বাক্যে পরিণত হয়েছে, যার সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। মুসলিমদের

১. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৩৯।

জীবনে পুরো দিনে কয়েকবার উচ্চারণ করা ব্যতীত এর ভিন্ন কোনো দাবির প্রতিফলন ছিল না। এ ছাড়া কালিমার বিশ্বাস একনিষ্ঠভাবে কোনো মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পরিবর্তে অগণিত কুসংস্কার ও ব্যক্তিপূজায় ভরে গিয়েছে।

ইবাদতের বিস্তৃত সামগ্রিক বুঝ পরিবর্তন হয়ে শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে কেউ এগুলো পালন করেই ভাবে যে, সে সমস্ত ইবাদত আদায় করে ফেলেছে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার আর কোনো দায়িত্ব নেই; এমনকি আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো জীবনের বাস্তবতা থেকে পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, দুনিয়ার জীবনে যেগুলোর কোনো প্রভাব ও প্রতিফলন নেই।

তাকদির ও আল্লাহর ফায়সালার বিশ্বাস, যা সঠিক অর্থে জীবনের অনেক শক্তিশালী প্রেরণা ছিল। এখন তা বিকৃত হয়ে কাজ, উদ্যম, প্রচেষ্টা ও আসবাব থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি উপযুক্ত আসবাব গ্রহণ করে আল্লাহর ওপর সত্যিকার তাওয়াক্কুল করা ও আল্লাহর চলমান নীতি অনুসরণের পরিবর্তে আলৌকিক নীতি ও জিন-জাদুর পেছনে ছোটা ভ্রান্ত প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে বলেছেন,

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

'যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা (অবস্থান) সুদৃঢ় করবেন।'[২]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً

'ওহে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা ওষুধ গ্রহণ করো। কারণ, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার ওষুধ দেননি।'[৩]

দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে সম্পর্কের সঠিক বুঝ, যা দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্রে পরিণত করে, এটা পরিবর্তন হয়ে এখন দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে সম্পূর্ণ সম্পর্ক

২. সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং ৭।
৩. সহিহু ইবনি হিব্বান, হাদিস নং ৬০৬১।

ছিন্ন হয়ে গেছে। যা এই দুটোকে বিপরীত অবস্থানে নিয়ে গেছে। ফলে যে দুনিয়া চায়, সে আখিরাত পরিত্যাগ করে; আর যে আখিরাত চায়, সে (ভুল পদ্ধতিতে) দুনিয়া ত্যাগ করে। এবং দুটোর কোনো একটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

আর আল্লাহর জমিন আবাদ করার দায়িত্ব তখনই পরিত্যাগ করেছে, যখন আখিরাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করেছে। ফলে মানুষের ওপর দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, রোগবালাই জেঁকে বসেছে এবং তারা সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে পিছিয়ে গেছে। এসব থেকে ভয়ংকর বিষয় হলো, তারা এটা মনে করছে যে, এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনিবার্য তাকদির, যেখানে তাদের সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই।

এসব কিছু ছাড়াও মানুষের জীবন আধ্যাত্মিকতা-শূন্য হয়ে গেছে। পুরো জীবনটা এখন কিছু প্রথায় পরিণত হয়েছে, যা শুধু প্রথা হিসেবে রক্ষা করা হচ্ছে। এ জন্য নয় যে, এটা জীবন্ত এক জীবনাদর্শের অংশ। ফলে এখন ইবাদত হচ্ছে কিছু প্রথা, আচরণ হচ্ছে প্রথা, নারীর পর্দা হচ্ছে প্রথা, সম্ভ্রম রক্ষা হচ্ছে শুধুই প্রথা—যেখানে আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে সচেতন অনুভূতি বা জীবনাদর্শের বুঝ বা অনুভূতি নেই।

তাই মুসলিমদের এহেন করুণ হালতে যখন নব্য ক্রুসেডহামলা হয়েছে, তখন তারা অধঃপতিত হয়েছে এবং ভ্রষ্টতার সামনে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে নব্য ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে মুসলিমদের বীরত্বের বহু ঘটনা সংরক্ষিত রয়েছে, যারা সতেরো শতক থেকে মুসলিম-ভূমিগুলোর ওপর আক্রমণ করে যাচ্ছে; চাই তা হোক উত্তর আফ্রিকাতে বা মধ্য আফ্রিকায় বা নীলের উপকণ্ঠে (মিশর ও সুদান) বা হিন্দ, মালাউ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন বা মধ্য এশিয়াতে, যেখানে রুশের ক্রুসেডশক্তি দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

কিন্তু এসব ছিল পরাজয় ও লাঞ্ছনার বীরত্ব, যারা আত্মসমর্পণের পূর্বে শেষ আঘাত করেছে মাত্র। কেননা, ততদিনে মুসলিম-সমাজের মানুষের সঠিক আকিদা-বিশ্বাস মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে। তাদের সামনে পরাজয় ও আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না।

ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়, যাদের সাথে মুসলিমদের সভ্যতার অধঃপতনের সময় সাক্ষাৎ হয়েছে। যে মিশ্রণের ফলে মুসলিমদের আত্মিক

পরাজয় ঘটেছে এবং তারা পশ্চিমাদের চিন্তাধারা ও শাসনব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে তাদের মতোই দ্বীন, আখলাক ও ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেছে।

সভ্যতার বিভাজনের ব্যাপারে এই কথাগুলো সত্য। তবে যদি এ ধারণা করা হয় যে, এটাই মুসলিমদের আত্মিক পরাজয় ও পশ্চিমাদের সামনে ভেঙে পড়ার মূল কারণ, তাহলে তা বাস্তব সত্যের কাছাকাছি তো নয়ই; বরং তা হবে চরম পর্যায়ের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। কেননা, এই চিন্তাগুলো মুসলিমদের পরাজয়ের সঠিক কারণকে ঢেকে ফেলে, তেমনই মুক্তির সঠিক মাধ্যম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

মুসলিমরা প্রথম যুগে বেদুইন গ্রাম্য জীবনযাপন করত, যাদের কাছে তাদের পার্শ্ববর্তী সভ্যতাগুলোর মতো বস্তুগত বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত মাধ্যম ও উপাদান ছিল না। তাই যদি তারা বস্তুগত ও বিজ্ঞানের উন্নত সভ্যতা প্রত্যাশা করত, তাহলে তাদের জন্য আবশ্যক ছিল ডানের ও বামের প্রাচীন পারস্য ও রোম থেকে তা গ্রহণ করা।

তারা বাস্তবেও এমনটাই করেছে; কিন্তু কখনো তাদের মাথা ভিন্ন জাতির সামনে নত করেনি। কখনোই কাফিরদের সভ্যতার প্রতি মুগ্ধতা অনুভব করেনি; বরং তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ। কারণ, তারা ছিল মুমিন।

তাদের পার্শ্ববর্তী কাফির ও পৌত্তলিকদের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের প্রবল প্রয়োজন ছিল; কিন্তু এই প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা কখনো কাফিরদের সামনে নিজেদের তুচ্ছ মনে করেনি। তা এ জন্য নয় যে, কাফিররা তাদের থেকে নিকৃষ্ট; বরং তারা এটা জানত এবং অনুভব করত যে, সম্মান শুধু তাদেরই প্রাপ্য; কেননা, সকল সম্মান শুধুই আল্লাহ তাআলা, রাসুল ও মুমিনদের জন্য। কাফির ও পৌত্তলিকদের কোনো সম্মান নেই; যদিও তারা দুনিয়ার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সম্পদের মালিক হয়ে যায়।

যখন তারা অন্যদের থেকে কিছু গ্রহণ করেছে, তখন গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ইমানের ছোঁয়ায় মর্যাদার উচ্চ অবস্থান ছিল স্পষ্ট। যা দুটি মূল বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হয়েছে :

প্রথমত, তাদের থেকে সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান গ্রহণের প্রয়োজনের প্রবল চাপেও তাদের অন্তর কখনো শত্রুদের সামনে পরাজিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, তারা শত্রুদের থেকে যা পেয়েছে, সব গ্রহণ করেনি; বরং তারা বুঝেশুনে শুধু যেগুলো প্রয়োজন মনে হয়েছে, সেগুলোই গ্রহণ করেছে এবং এটা নিশ্চিত করেছে, যেন সেখানে ইসলামের আকিদা-বিধানের বিরোধী কিছু না থাকে। আর যেগুলোকে

তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় বা ইসলামের চিন্তা-বিশ্বাসের বিপরীত মনে হয়েছে, তা সব ত্যাগ করেছে। যার স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, তারা গ্রিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করেছে; কিন্তু তাদের প্রসিদ্ধ রূপকথার গল্পগুলো গ্রহণ করেনি। কেননা, সেগুলোয় তারা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত পৌত্তলিক জাহিলিয়াত দেখতে পেয়েছে, যা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত নয়; এগুলো বরং ধ্বংস করাই কাম্য।

কিন্তু শেষ বা আধুনিক সময়ে তাদের থেকে আহরণের পুরো পদ্ধতিই পালটে গেছে। এখানে মূল সমস্যা দাতা ও গ্রহীতার মাঝে সভ্যতার বিরোধ নিয়ে নয়, যা প্রথম দৃষ্টিতে সাধারণভাবে মনে হয়; বরং এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে কাফিরদের থেকে সভ্যতার মাধ্যম গ্রহণের পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে মূল সমস্যা।

প্রথম যুগে মুসলিমরা ছিল মর্যাদাবান; যদিও তারা গ্রহণ করেছে। কেননা, ইমানের দ্বারা সম্মানিত হয়ে তাদের জীবন ও অবস্থানকে উচ্চাসনে সমাসীন করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে এসে মুসলিমদের আকিদা নষ্ট হয়ে ধূলির নিচে চাপা পড়ে গেছে। ফলে সেখানে কোনো সম্মান বাকি থাকেনি; বরং পরাজয় ও অধঃপতন ঘটেছে। তারা পশ্চিমাদের থেকে বাছবিচার ছাড়া সব গ্রহণ করেছে। কোনটা উপকারী বা মন্দ এবং কোনটা ইসলামের পক্ষে বা বিরোধী, তা যাচাই করা ব্যতীতই। কেননা, ইসলাম তখন এসব আধুনিক মুসলিমের মূল লক্ষ্য ছিল না। তাদের কাছে এর কোনো বিশেষ এমন অবস্থান ছিল না যে, ইসলাম থেকে তারা সঠিক বিশ্বাস গ্রহণ করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে।

এখন যুগের পরিবর্তন হচ্ছে। মুসলিমদের জীবন থেকে শেষ শতাব্দীর বীভৎস চেহারা সরে যেতে শুরু করেছে এবং ইসলামের নতুন বসন্তের আগমন ঘটছে। মানুষরা বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকরা ইসলামে ফিরতে শুরু করছে। তারা স্বচ্ছ সমস্যামুক্ত ইসলাম পালনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিশ্বের যত জায়গায় ইসলাম কখনো শাসন করেছে, সেখানে ইসলামি পুনর্জাগরণ হচ্ছে। যুবকরা এমন দিনের জন্য অপেক্ষা করছে, যেদিন ইসলাম বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যেদিন মুসলিমরা পশ্চাৎপদতা থেকে ফিরে এসে সত্যিকার ইসলামকে জমিনে স্থাপন করবে। যা হবে আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদার বাস্তবায়ন—

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানাবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলিফা বানিয়েছিলেন; তিনি তাদের জন্য যে (ইসলাম) দ্বীনকে পছন্দ করেছেন, তা তাদের জন্য অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং ভয়ের পর এর পরিবর্তে অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না।'[৪]

চলার পথে অনেক বাধা আসে, যা অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে; কিন্তু এগিয়ে যাওয়াকে কখনো থামিয়ে দিতে পারে না।

বর্তমানে একদিকে মানুষ সঠিক ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং চিন্তাধারা ও আচরণে দ্বীনের বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। অন্যদিকে চিন্তাযুদ্ধের দ্বারা মানুষকে, বিশেষত যুবকদেরকে সামগ্রিক ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পশ্চিমাদের অনুসরণের দিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। সব চারিত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে। এ ছাড়া ইসলামের ওপর বহু আঘাত আসছে, সর্বত্র দ্বীনের দায়ি ও মুজাহিদদের দমন করা হচ্ছে। তাদের পথে সর্বাত্মকভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এসব সত্ত্বেও বহু সুসংবাদ রয়েছে, যেগুলো আমার মতে এই বাধাগুলো থেকেও বড়ো। কেননা, মুসলিম-বিশ্বের সর্বত্র আজ যে ইসলামি নবজাগরণ হচ্ছে, তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যার বহু নিদর্শন রয়েছে। এটা একদিকে জায়ানবাদী ক্রুসেডারদের প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ মুসলিম উম্মাহকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার বহু প্রচেষ্টার পর হচ্ছে, অন্যদিকে মানবজাতি আজ ঐতিহাসিক ক্ষণে দণ্ডায়মান। তারা অন্তঃসারশূন্য বস্তুবাদী সভ্যতা থেকে হতাশ হয়ে নতুন মুক্তির পথের সন্ধান করছে।

সুতরাং মুসলিমরা ততদিন পর্যন্ত তাদের বিপর্যয় থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের ওপর থেকে পরাধীনতার শিকল ছিন্ন হবে না এবং তারা বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে

৪. সুরা আন-নুর, আয়াত নং ৫৫।

বিশ্ব-শাসনের মসনদে ফিরে আসতে পারবে না, যতদিন না তারা আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত দ্বীনের দিকে সঠিক ও সততার সাথে ফিরে আসবে। তেমনই মানবজাতি তাদের সমস্যা ও জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত হতে পারবে না আল্লাহর দেখানো পন্থা গ্রহণ করা ব্যতীত, যা আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের জন্য নাজিল করেছেন।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

'আমি স্পষ্ট নিদর্শনসহ আমার রাসুলদের পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড দিয়েছি; যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।'[৫]

কিন্তু বিষয়টা ফুলবিছানো পথে সহজে আনন্দের সাথে হয়ে যাবে না; বরং এটা এমন কঠিন যাত্রা, যেখানে পথ কাঁটা, অশ্রু, রক্ত ও শাস্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। যেখানে মুসলিমরা ইসলামের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে, তাদের সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে; যতদিন না ইসলামের দ্বিতীয় অপরিচিত (গরিব) যুগ শেষ হয়ে আবার জমিনে প্রতিষ্ঠিত হয়—যেমনটা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে, তা আবারও শুরুর মতো অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে; তাই গুরাবাদের (অপরিচিতদের) জন্য সুসংবাদ।'[৬]

فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي

'অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ, যারা আমার পরে মানুষ আমার যেসব সুন্নাহকে নষ্ট করেছে, তা সংশোধন করবে।'[৭]

এই কিতাবে আমরা ইসলামের প্রথম সোনালি যুগ থেকে বর্তমান খড়কুটোয় পরিণত হওয়া পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর ওপর আপতিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করব। যে ব্যাপারে হাদিসে এসেছে,

৫. সুরা আল-হাদিদ, আয়াত নং ২৫।
৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪৫।
৭. সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৩০।

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ،...

'খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্রিত হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে।' একজন বলল, 'সেদিন কি আমাদের সংখ্যায় কম থাকার কারণে এরূপ হবে?' তিনি বললেন, 'বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটার ন্যায়।...'[৮]

আমি এখানে ইসলামকে বাস্তব জমিনে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকারী যুবকদের কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কেন এই পথ দীর্ঘ হয়েছে? কেন বিজয় আসতে বিলম্ব হচ্ছে? দ্বীনের দাওয়াতের মানহাজ কী? সঠিক পথ কোনটা?

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

'আমি শুধু চাই আমার সাধ্যানুযায়ী সংস্কার করতে । (তবে) আমার সাফল্য কেবল আল্লাহর সাহায্যেই আসতে পারে।'[৯]

বক্ষ্যমাণ বইয়ে যা কিছু সঠিক, সেগুলো শুধুই আল্লাহর তাওফিকে এসেছে। আর যেখানে ঘাটতি রয়েছে, আমি মনে করি আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, বাকি আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান চাই। আল্লাহর কাছে দুআ করি, যাতে তিনি ইসলামের জন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তিদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

- মুহাম্মাদ কুতুব

৮. সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং ৪২৯৭।
৯. সুরা হুদ, আয়াত নং ৮৮।

সোনালি প্রজন্মের আদর্শ

যাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (خَيْرُكُمْ قَرْنِي) 'তোমাদের মধ্যে আমার প্রজন্মই সর্বোত্তম।'[১০]

যারা আল্লাহ তাআলার এই বাণীর পূর্ণরূপে উপযুক্ত—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

> 'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।'[১১]

তারা ছিল এমন প্রজন্ম, যেখানে আদর্শ ও বাস্তবতার সম্মিলন ঘটেছে। ফলে ইসলামের আদর্শগুলো বাস্তবে প্রয়োগ হয়েছে এবং মানুষের বাস্তবতা দৃষ্টান্তের স্তরে পৌঁছে গেছে। কেননা, বাস্তব আদর্শ বা আদর্শের বাস্তবতা এই দ্বীনের মূল বৈশিষ্ট্য।

এই দ্বীন এমন কোনো রুহানি আদর্শ পেশ করে না, যা বাস্তবায়ন করা কঠিন। যেখানে মানুষের প্রয়োজন ও বস্তুগত অবস্থানকে উপেক্ষা করে এবং মানুষকে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে আকাশে ঝুলিয়ে রাখে—যেমনটা হিন্দু, বৌদ্ধ ও পাদরিরা করে থাকে। আবার অন্যদিকে শুধু শারীরিক ও দুনিয়াবি বিষয়ে মগ্ন রেখে মানুষকে এসব প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ করে ফেলে না; যার ফলে সে সেখানে আটকে গিয়ে উত্তম আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হবে; বরং এই দ্বীন একই সাথে দুই পার্শ্বকেই ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যতার সাথে গ্রহণ করে। যার ফলে তার মধ্যে এমন আদর্শ ফুটে ওঠে, যা বাস্তবতাকে অবহেলা করে না এবং এমন বাস্তবতা গ্রহণ করে, যেখানে আদর্শকে ত্যাগ করা হয় না। যার সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটেছে ইতিহাসের একমাত্র অদ্বিতীয় সেই সোনালি যুগে।

....

১০. সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ২৬৫১।

১১. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

সেই প্রজন্মের মানুষগুলোর ব্যাপারে জানা আমাদের জন্য অতীব জরুরি; যেন বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের অবস্থান জানতে পারি এবং সেই প্রজন্মের সাথে তুলনা করে ইসলাম থেকে আমাদের দূরে বা নিকটে থাকাটা পরিমাপ করতে পারি।

তবে সেই মহান প্রজন্মের উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলো জানার পূর্বে আমাদের সেসব উপাদানের ব্যাপারে জানতে হবে, যেগুলো তাদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। যার ফলে তারা ইতিহাসে সেই উচ্চাসনে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছে।

আরব ছিল শতধা বিক্ষিপ্ত, যারা কোনো বিষয়েই একমত হতো না; অথচ তাদের মাঝে ঐক্যের সকল উপাদান মজুত ছিল—যেমন এক ভূমি, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, একই ইতিহাস, একক স্বার্থ। জাহিলি সমাজবিজ্ঞান মতে, এগুলোই একটি জাতি গড়ে তোলে। অথচ এসব উপাদান নিয়ে শত শত বছর পার হওয়ার পরেও সেখানে কোনো শক্তিশালী জাতি জন্ম নেয়নি; বরং তারা ছিল যুদ্ধবাজ গোত্রে বিভক্ত, যারা লড়াই ও প্রতিশোধ নিয়েই জীবন পার করত। এ ছাড়া জাহিলিয়াতই তাদের নিঃশেষ করে দিচ্ছিল।

সেখান থেকে ইসলাম এসে তাদের উদ্ধার করেছে। শুধু ব্যক্তি বা গোত্র হিসেবে নয়; বরং এমন এক উম্মাহ হিসেবে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলাই ইতিহাসের সর্বোত্তম জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

> 'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।'[১২]

কিন্তু কীভাবে এ মহান জাতি গঠিত হয়েছে, কোন উপাদানগুলো তাদের ওপর প্রভাব ফেলেছে, তা আমাদের বুঝতে হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, তাদের মূল গঠন সেটাই ছিল, যা এই মহা ঘটনার পূর্বে একই ভূমিতে কয়েক শতাব্দী যাবৎ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কোনো একটা জিনিস তাদের মধ্যে জাদুর মতো কাজ করেছে; যার ফলে এই ব্যক্তিদের থেকে মাত্র কয়েক বছরে অদ্বিতীয় এক জাতি বের হয়ে এসেছে। তাহলে সেই আশ্চর্যজনক জিনিসটা কী, যা এই মহান প্রজন্মকে গড়ে তুলেছে?

১২. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

মৌলিকভাবে নিঃসন্দেহে এটা ছিল কুরআন, সেই মহান কিতাব, যা মানবজাতিকে রবের হিদায়াতের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য নাজিল হয়েছে,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

'নিশ্চয়ই এই কুরআন সর্বাধিক সঠিক পথ দেখায়।'[১৩]

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

'এই কুরআন তো আমার কাছে মূল গ্রন্থে (লাওহে মাহফুজে) সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয়ই তা সুমহান, প্রজ্ঞাপূর্ণ।'[১৪]

কুরআন মানুষের অন্তরে কী প্রভাব ফেলে? এটা কি মনুষ্যত্বকে পরিবর্তন করে ভিন্ন এক জীবে পরিণত করে? কখনোই না; বরং তা মানুষের জন্যই নাজিল হয়েছে; যাতে মানুষ তাদের ফিতরাতের দিকে ফিরে, যা দিয়ে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আল্লাহর স্বাভাবিক রীতি (মেনে চলো), যে অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'[১৫]

ধরুন, লোহাকে যদি চুম্বকের সাথে ঘর্ষণ করা হয়, তখন এর মূল উপাদান পালটে যায় না; বরং এর পরমাণুর গঠনকে বিন্যাস করে এর মধ্যে তড়িৎ চুম্বকীয় নতুন শক্তি সৃষ্টি হয়, যা পূর্বে ছিল না। তেমনই আল্লাহর কিতাবে নাজিলকৃত দ্বীন মানুষের অন্তরে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে এর গঠনকে বিন্যাস করে। ফলে পূর্বের পথভ্রষ্টতা থেকে সুগঠিত এক শক্তিতে পরিণত হয়।

তবে এই কিতাবের কোন বিষয়টা এই শক্তির উৎস, যা পথভ্রষ্ট মানুষকে পরিশুদ্ধ মানুষে পরিণত করে? এটা কি ভাষার অলৌকিকত্ব? না বর্ণনার জাদু? বা অর্থের স্পষ্টতা? এটা কি আখিরাতের বর্ণনা ও অবস্থার বিবরণ, যা অন্তরকে প্রকম্পিত করে?

১৩. সুরা আল-ইসরা, আয়াত নং ৯।

১৪. সুরা আজ-জুখরুফ, আয়াত নং ৪।

১৫. সুরা আর-রুম, আয়াত নং ৩০।

না এর আইন-বিধান, নির্দেশনা ও নীতিমালা? এটা কি এর ঘটনাবলি, দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা? না সেখানের বারংবার আল্লাহর মর্যাদা ও আলৌকিক ক্ষমতার আলোচনা? নিঃসন্দেহে এ সবগুলোই। কেননা, কুরআনের প্রতিটা শব্দের উপযুক্ত নিদর্শন ও প্রভাব রয়েছে।

তবে আমরা ভুল করব না যদি বলি, কুরআনের সবচেয়ে বিস্তৃত আলোচিত বিষয় হচ্ছে উলুহিয়্যাহ বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আলোচনা। যদিও প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে, কুরআনে—বিশেষত মাক্কি সুরায়—এই বিষয়টাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, এখানে মুশরিকদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য মিথ্যা ইলাহ বিশ্বাস করত। তাই এটাই উচিত যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে; যাতে তা মুশরিকদের বিশ্বাসে পরিণত হয়।

কিন্তু কুরআনে মাদানি সুরাগুলোতেও এই আলোচনা চালিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে মুমিনদের প্রতি সম্বোধিত বাণীতে—যারা ইমান এনেছে এবং তাদের অন্তরে ইমান স্থির হয়েছে; এমনকি তারা মুসলিম জাতি ও ইসলামি রাষ্ট্রও গঠন করেছে এবং মুসলিম বাহিনী গড়ে তুলেছে, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে—এসব কিছু অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, তখনও এই বিষয়ের সমপরিমাণ গুরুত্ব অবশিষ্ট ছিল; যদিও সম্বোধিত ব্যক্তিরা মুমিন। তখন এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য এ নয় যে, সম্বোধিত ব্যক্তিরা কুরআনকে অস্বীকার করছে; বরং এটা হচ্ছে মানব অন্তরের চাবি, যা দ্বারা কল্যাণের সকল দরজা খুলে যায়। তার মধ্যে কল্যাণ জন্ম নেয়। সে কল্যাণের ওপর গড়ে ওঠে। তার থেকে কল্যাণকর বিষয় বের করে আনে। অন্তরের জন্য এমন আর কোনো চাবি নেই, যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সমকক্ষ হবে।

অন্তর যখন অস্বীকারকারী হয়, তখন এই বিষয় দ্বারা সম্বোধন করা হয়; যাতে তা সত্য ও কল্যাণের জন্য উন্মুক্ত হয়। আর যখন অন্তর মুমিন হয়, তখনও সম্বোধন করা হয়; যাতে ইমান গভীরভাবে প্রোথিত হয়। কেননা, এটাই একমাত্র পাথেয়, যা ছাড়া ভিন্ন কোনো পাথেয় নেই। এই আয়াতের দিকে লক্ষ করুন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং তিনি যে কিতাব তাঁর রাসুলের ওপর নাজিল করেছেন, এর প্রতি ইমান আনো।'[১৬]

১৬. সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ১৩৬।

এখানে মুমিনদেরই ইমানের আদেশ করা হচ্ছে! অথচ তারা সেসব বিষয়ে ইমানদার, যা দ্বারা ইমান অর্জিত হয়! এর কারণ, যাতে তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের অন্তরের ইমানের প্রতি সতর্ক থাকে।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ওপর ইমান সেসব মুশরিকের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করেছে; ফলে তাদের থেকে নতুন এক জাতির জন্ম হয়েছে। অতঃপর তা মুমিনদের অন্তরে প্রভাব ফেলেছে; ফলে তারা অতুলনীয় প্রজন্মে পরিণত হয়েছে, যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে।'[১৭]

সুতরাং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হচ্ছে অন্তরের চাবি। অন্তর যখন সঠিক দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর নুরের হিদায়াত লাভ করে, তখন এটা দ্বারা পথ খুলে যায়। কেননা, মানুষ স্বভাবগতভাবে গোলাম। যেখানে শুধু ইবাদতের দিক পরিবর্তন হয়। আর তার প্রভুর প্রকৃতি অনুযায়ী তার জীবনপদ্ধতি পরিবর্তিত হয়।

যখন আল্লাহ তাআলা মাবুদ হবে, তখন তার জীবন আল্লাহ তাআলার পথে পরিচালিত হবে, যেখানে হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ ও বৈধ-অবৈধ বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে। আর যখন কারও মাবুদ অন্য কিছু হবে, তখন তার জীবনপদ্ধতি সেটার চাহিদামাফিক হবে; চাই তা রাখডাক ছাড়া সরাসরি প্রবৃত্তি হোক বা এমন প্রবৃত্তি, যা বিভিন্ন স্লোগান, শিরোনাম ও পর্দা দ্বারা আবৃত। তবে ভিন্ন ভিন্ন সুরতের সকল জাহিলিয়াতই মূল উৎসে এক, তা হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ। হয়তো তা কোনো একক ব্যক্তির চাহিদা বা কিছু মানুষের সমষ্টির চাহিদা বা সকল মানুষের সামষ্টিক চাহিদা—সবগুলো দিনশেষে হাওয়া বা মনের চাহিদা ও প্রবৃত্তি।

একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত জীবনবিধানই মানুষের অন্তর ও কার্যক্রমকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। কেননা, তা এমন দয়ালু মহাজ্ঞানী সত্তার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাদের কল্যাণের বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত। যাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, যাঁর কাছ থেকে কিছুই গোপন নয়। তিনি মানুষের সেসব কাজের ফল সম্পর্কে জানেন, যা বহু বছর পরে

১৭. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

প্রকাশিত হয়; অথচ হয়তো মানুষটি তার জীবদ্দশায় তা জানতে পারবে না। এই দ্বীন এমন ন্যায়বান শাসকের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত, যাঁর ফায়সালা কখনো প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী, যাঁর হুকুমে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রয়োজন প্রভাব ফেলে না। এসব ছাড়াও তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি একমাত্র মানুষের জন্য জীবনবিধান প্রণয়নের অধিকারী; কেননা, তিনি তাদের ও সমগ্র জগতের স্রষ্টা। তিনি যেহেতু সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনিই আদেশ-বিধানের কর্তা।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

'জেনে রাখো, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। আল্লাহ মহিমান্বিত, যিনি সারা জাহানের পালনকর্তা।'[১৮]

মানুষ আল্লাহর পথে স্থির হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে সততা ও ইয়াকিনের সাথে জানবে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। সে নিজেকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করবে; যখন বিশ্বাস করবে, তিনি মহা শক্তিধর রিজিকদাতা। তিনি উপকার ও ক্ষতির মালিক। তিনি জীবন ও মৃত্যুদাতা। তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের পরিচালক। শুধু তাঁর ইচ্ছাই এখানে বাস্তবায়িত হয়। তিনি ছাড়া অন্যকিছু বাস্তবতার কোনো কিছুরই অধিকারী নয়। তারা বাহ্যত যেসব কিছুর অধিকারী, সেগুলো শুধুই আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির বলে।

মানুষ যখন এসব মেনে নেবে, তখনই আত্মসমর্পণ করবে। আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব মেনে নেবে। তাঁর ইচ্ছা ও তাকদির গ্রহণ করবে। তাঁর আদেশ ও নিষেধ মান্য করবে। তাঁর দ্বীনকে জীবনের পথ-পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করবে।

তবে এই দ্বীন জমিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মানুষের তা প্রতিষ্ঠার প্রতি আগ্রহ বা নিজেদের এর সামনে সঁপে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। কেননা, আল্লাহর ইচ্ছা ও তাকদির এটাই যে, সকল মানুষ একই জাতিতে একত্রিত হবে না।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ - إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ

'আপনার প্রভু যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি সব মানুষকে অবশ্যই এক জাতি করতে পারতেন; কিন্তু তাতেও তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে

১৮. সূরা আল-আরাফ, আয়াত নং ৫৪।

যাদেরকে আপনার প্রভু অনুগ্রহ করেন, তাদের কথা ভিন্ন। এ জন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন।'[১৯]

এখানে এমন অনেকে থাকবে, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ওপর ইমান আনবে না। একে অপছন্দ করবে, দ্বীন ও দ্বীনের ধারকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং এর জীবনবিধানকে বাধা দেবে। তাই জমিনের বুকে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হলো, এই কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাধ্যমে কাফিরদের সাথে জিহাদ করা, যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে অপছন্দ করে।

আল্লাহর দ্বীন জমিনে প্রতিষ্ঠার জিহাদে মানুষ বিপদের সম্মুখীন হবে, মৃত্যুর মুখোমুখি হবে, দুনিয়ার উপভোগ থেকে বঞ্চিত হবে; তাই মানব অন্তর এই জিহাদের ভয়াবহতা সহ্য করা ও বিভিন্ন বিপদসংকুল পথে প্রবেশের জন্য আবারও বিশ্বাস করা প্রয়োজন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবন-মৃত্যুদাতা, তিনি উপকার বা ক্ষতির মালিক, তিনিই রিজিক হ্রাস-বৃদ্ধি করেন। অন্যথায় এ পথের প্রথম ধাক্কায় তার পা পিছলে যাবে। বিপদের এক মুহূর্তেই তার অন্তরের অভ্যন্তরীণ ইমান নড়ে যাবে যে, আল্লাহ তাআলাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাকদির পরিবর্তন করেন এবং তিনিই কল্যাণ বা মন্দ বা জীবন বা মৃত্যু বা রিজিক বৃদ্ধি ও হ্রাস নির্ধারণ করেন। সঠিক পথ থেকে সে বিচ্যুত হবে এবং ভ্রষ্টতায় পতিত হবে। তবে যাকে আল্লাহ আপন দয়ায় রক্ষা করেন, তার ইমান স্থির হয় এবং নতুন পদক্ষেপে এগিয়ে যায়।

তাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'ই হচ্ছে জিহাদের আসল প্রস্তুতি ও ইদাদ, যেমন পূর্বে তা ছিল ইসলাম ও আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণের মূল ভিত্তি।

এমনকি যুদ্ধবিহীন সন্ধির সময়ে, প্রশান্তি ও আরামের মাঝেও কিছু বোঝা মানুষের অন্তরকে সঠিক পথে অবিচলতা থেকে বাধাগ্রস্ত করে। সেগুলো হলো কামনাবাসনার বোঝা, যা মানুষের কাছে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'নারী, সন্তানাদি, স্বর্ণ-রৌপ্যের অঢেল সম্পদ, ছাপযুক্ত (সুন্দর) ঘোড়া, গবাদিপশু ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদি কাম্যবস্তুর আকর্ষণ মানুষের জন্য

১৯. সুরা হুদ, আয়াত নং ১১৮-১১৯।